বেণীগীর ফুলবাড়ি

(গল্পগ্রন্থ – বেণীগীর ফুল বাড়ি)

মুঙ্গেরের কষ্টহারিণী ঘাটে রোজ সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে ললিতবাবুর দেখা হইত।

আমি পিসিমার বাড়ি বেড়াইতে গিয়াছিলাম। পশ্চিমের শহরে তাহার পূর্বে কখনও বেড়াইবার অভিজ্ঞতা ছিল না, আমার এক বন্ধু আসিবার সময় বলিয়াছিল—ওখানে জুতায় কালি দেওয়ার কোনো দরকার হবে না দেখো।

দেখিলাম, ব্যাপার তাই বটে। লাল ধূলা মাখিয়া জুতার যে দশা হয় পনেরো মিনিট রাস্তা চলিবার পরেই, তাহাতে জুতায় কালি দিবার উৎসাহ ক্রমে কমিয়া গেল। শহরের মধ্যে বা বাহিরে যে কোনো জায়গাতেই যাব, সর্বত্র ধূলা। ক্রমে বেড়াইবার উৎসাহও কমিয়া আসিল। তখন সন্ধ্যার পরে গঙ্গার ধারই দেখিলাম প্রকৃষ্ট স্থান। এদিক ওদিক বেড়াইয়া কষ্টহারিণীর ঘাটের সিঁড়ির উপর অনেক রাত পর্যন্ত একা বসিয়া থাকিতাম।

একদিন পাশে এক প্রৌঢ় বাঙালি ভদ্রলোক আসিয়া বসিলেন। কথায় কথায় আলাপ হইলে জানিলাম, তাঁহার নাম ললিতমোহন ঘোষাল, বাড়ি হুগলী জেলায়—ভবঘুরে লোক, আগে ছিলেন বর্ধমান টাউনে, ম্যালেরিয়ায় স্বাস্থ্যহানি হওয়ায় পশ্চিমে আজ প্রায় দশ-বার বৎসর আসিয়া বাস করিতেছেন। ক্রমে ললিতবাবুর সহিত প্রত্যহ দেখা হইত, ঘাটে বসিয়া গল্প করিতাম অনেক রাত পর্যন্ত।

একদিন তিনি আসিয়া আমায় বলিলেন—আপনি একজন সাহিত্যিক, এ কথা তো এতদিন আমায় বলেন নি?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কার মুখে শুনলেন আবার এ কথা?

—সবাই বলছে। আপনি সোমবার বেথুনবাজার লাইব্রেরিতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন শুনলাম। আমার বাড়িওয়ালার ছেলে ছিল সভায়—

—হ্যাঁ, ও!... তা বটে।

—বড় আনন্দ হলো আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে। আমিও নিজে একটু আধটু লিখতুম কিনা এক সময়ে, তাই সাহিত্যিকদের বড় শ্রদ্ধা করি মশায়—আপনি বয়সেঅনেক ছোট হলেও আমার নমস্য—

আমি বিনয়সূচক হাস্যসহকারে বলিলাম—কি যে বলেন!

—একদিন আসুন না গরিবের বাসায়। লেখাটেখাগুলো আপনাকে দেখাব। এককালে যথেষ্ট হেঁ হেঁ—লোকে জানতো। আমার উপন্যাসের দু-তিনটে এডিশন হয়েছে মশাই—

শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলাম। বাল্যে আমি তখনকার সময়ের হেন উপন্যাস ছিল যাহা পড়ি নাই। কিন্তু ললিত ঘোষালের নাম ঔপন্যাসিক হিসাবে কোথাও পাই নাই, কাহারও মুখে শুনিয়াছি বলিয়াও তো মনে হইল না।

কৌতূহলবশত একদিন ললিতবাবুর সঙ্গে তাঁর বাসায় গেলাম। স্টেশনের কাছে লাইনের ধারে একটা ছোট পুরানো বাড়ির বাহিরের ঘরে তাঁর বাসা। অতি অপরিষ্কার ঘর, কতকাল যেন ঝাঁট পড়ে নাই, বিছানাপত্র ততোধিক ময়লা, ছেঁড়া তুলো-বেরুনো ওয়াড়বিহীন বালিশ, ময়লা গামছা ও ঘরে পরিবার ধুতি দেখিয়া মনে হইল ললিতবাবুর বর্তমান অবস্থা আদৌ সচ্ছল নয়। ললিতবাবু আমায় যত্ন করিয়া বসাইলেন। বলিলেন, একটু চা খান দয়া করে এসেছেন যখন।

আতিথ্যের কোনো ত্রুটি হইল না। নিজেই চা করিয়া দুখানা আটার রুটিতে গুড় মাখাইয়া আমায় খাইতে দিলেন। হুঁকায় তামাক সাজিয়া আমায় দিতে গেলেন, আমার ও-সব চলে না শুনিয়া দুঃখিত হইলেন।

নিজে তামাক খাওয়া শেষ করিয়া তিনি একখানা পুরানো বাঁধানো খাতা আমার কাছে আনিয়া খুলিলেন। আমার দিকে সলজ্জ হাসিয়া বলিলেন—এই দেখুন, মানে—যত কাগজে আমার সমালোচনা বার হয়েছিল আপনাকে দেখাচ্ছি। সাগ্রহে খাতাখানি দেখিতে লাগিলাম। এখন হইতে বিশ-পঁচিশ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ইংরাজি ১৯১০ কি ১২ সালের দিকে যে সব খবরের কাগজে ও মাসিক পত্রিকায় সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন, যেমন ‘বঙ্গবাসী’, ‘ইংলিশম্যান’, ‘হিতবাদী’, ‘ভারত-মহিলা’ প্রভৃতি—সেই সব পত্রিকা হইতে তাঁহার বিভিন্ন পুস্তকের

সমালোচনাগুলি কাটিয়া আঠা দিয়া খাতাখানিতে আঁটিয়া রাখা হইয়াছে। প্রত্যেক টুকরাতে কাগজের নাম ও মাস তারিখ কালো কালি দিয়া হাতে লেখা। টুকরাগুলি বিবর্ণ, হলদে ও জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু খুব বেশি ধূলাবালি পড়িয়া নাই তাহাদের উপর—দেখিয়া মনে হয় খাতাখানির প্রতি যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হয় ও মাঝে মাঝে ঝাড়ামোছা করা হয়। ললিতবাবু প্রত্যেকটি আমায় পড়িয়া শোনাইতে লাগিলেন। দেখিলাম—তাঁহার বইয়ের এককালে বেশ ভাল সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। পড়িতে পড়িতে গর্বে ও আনন্দে তাঁহার মুখ চোখের ভাবই যেন বদলাইয়া গেল। একখানা ইংরাজি কাগজে তাঁহাকে বঙ্কিমচন্দ্রের সমকক্ষ বলা হইয়াছে, তবে ইংরাজ-সম্পাদিত ইংরাজি কাগজে—বলা বাহুল্য, তাহাদের যেমনজ্ঞান বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে, তেমনি জ্ঞান ললিত ঘোষাল সম্বন্ধে। উঠিব উঠিব করিতেছি এমন সময় ললিতবাবু বলিলেন, দুখানা বই লিখে রেখেছি, অনেকদিন হলো। মশায় তো কলকাতায় থাকেন, পাবলিশারদের সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ, বই দুখানার কিনারা করতে পারেন?

প্রধানত তাঁহারই আগ্রহে পড়িয়া সেদিন দুখানা ভারি মোটা খাতা আমাকে বাসায় বহন করিয়া আনিতে হইল।

আসিবার সময় ললিতবাবু বার বার বলিলেন, আমি যেন পাণ্ডুলিপি দুখানা ভাল করিয়া পড়িয়া দেখি। কিন্তু বাড়িতে আসিয়া খাতা দুখানা পড়িয়া ললিতবাবুর জন্য আমার কষ্ট হইল। অত্যন্ত সেকেলে ধরনের লেখা, জবড়জঙ্ ভাষা, সেন্টেন্সগুলি কাঠের পুতুলের ন্যায় নড়নচড়নবিরহিত প্রাণহীন। পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে পুণ্যের জয় ও পাপের শাস্তি পাঠকের চোখে আঙুল দিয়া দেখানো হইয়াছে। এ যুগে এ বই অচল। ললিত ঘোষালকে কথাটা খোলাখুলিভাবে বলিতে পারি নাই। কষ্টহারিণীর ঘাটে ললিতবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—পড়েছেন? কেমন লাগল?

বলিলাম—চমৎকার। একালে অমন লেখা আর দেখা যায় না।

কথাটার মধ্যে মিথ্যা ছিল না।

ললিতবাবু অত্যধিক খুশি হইয়া বলিলেন—হেঁ হেঁ, আপনি হলেন গিয়ে নিজে একজন লেখক—সমঝদার লোক। আপনাকে কি বুঝিয়ে বলতে হবে এসব? আজকাল লেখা বদলে গিয়েছে মশাই—লিখতে জানেই না। বঙ্কিম, হেমবাবু, নবীন সেন—কি সব মহামহারথী বলুন দিকি একবার? তা নয় রবিঠাকুর, রবিঠাকুর—হেঃ—

ললিতবাবু তাচ্ছিল্য ও বিরক্তির ভঙ্গিতে অন্যদিকে ঘাড় ফিরাইলেন।

আমি সমর্থনসূচক মাথা নাড়িলাম। ললিতবাবুর উপন্যাস দুখানির প্রশংসা করিয়া যে ভাল কাজ করি নাই, পরে তাহা বুঝিয়াছিলাম। দিন নাই রাত নাই ললিতবাবু তাগিদ দিয়া আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন যে, উপন্যাস দুখানির কি কিনারা করিলাম! এমন কি, সন্ধ্যাবেলায় কষ্টহারিণীর ঘাটে বেড়ানো প্রায় ছাড়িয়া দিতে হইল।

পাঁচ ছয় দিন ললিতবাবুর সঙ্গে দেখা হয় নাই। একদিন আমার বাসার চাকর বলিল—আপনাকে এক আওরৎ খুঁজছে বাইরে—

আওরৎ কে খুঁজিবে? বাহির হইয়া দেখি একটি সুন্দরী যুবতী সলজ্জ সংকোচের সহিত বাসার উঠানের পেঁপে-তলায় দাঁড়াইয়া আছে।

সবিস্ময়ে বলিলাম—কে?

মেয়েটি চোখ নীচু করিয়া দেহাতি হিন্দিতে বলিল—লোলিতবাবু আপনাকে একবার ডেকেচেন বাবুজী—

—ললিতবাবু? বেশ যাব ও-বেলা।

মেয়েটি চলিয়া গেল।

ভাবিলাম, মেয়েটি কে? ললিতবাবুর ঝি নাকি? কখনও সেখানে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। বেশ দেখিতে মেয়েটি। এ দেশের হিন্দুস্থানী মেয়েরা সচরাচর যেমন আঁটসাঁট গড়নের হয়, তেমন তো বটেই, ফর্সা, ধপ্‌ধপে রং, মুখশ্রীও বৈশ লালিত্যপূর্ণ।

সন্ধ্যাবেলায় ললিতবাবুর বাসায় গেলাম। ললিতবাবু উনুনে কড়া চাপাইয়া চায়ের জল গরম করিতেছিলেন। জল নামাইয়া দুধ ও ভেলিগুড় মিশাইয়া চা তৈরি করিয়া আমায় খাইতে দিলেন। আমি বলিলাম—একটি মেয়ে গিয়ে আমায় আপনার এখানে আসতে বল্লে। কদিন ব্যস্ত ছিলাম বলে আসতে পারি নি—

ললিতবাবু বলিলেন—ও, মণিয়া গিয়াছিল বুঝি? তা এসেছেন ভালই করেছেন। আমি ভাবছিলাম, কেন আর আসেন না!

স্বল্পমাত্র ভূমিকার পর ললিতবাবু আবার বইয়ের কথা পাড়িলেন।

—জানেন ব্যাপারটা, হাতে একটু টাকার ইয়ে যাচ্ছে। ভাবলাম বই দুখানার একখানাও যদি লাগিয়ে দিতে পারেন তবে এ সময়ে কিছু পেলে বড় উপকার হত। তাই মণিয়াকে ওবেলা আপনার ঠিকানা দিয়ে—তা করেছেন কিছু?

বড় বিপদে পড়িলাম দেখিতেছি। ও বইয়ের আমি কি করিয়া কি করিব বুঝিলাম না। সেকথা ললিতবাবুকে বলিতে কিন্তু আমার মন সরিল না, কেন কি জানি!

বলিলাম—আজ্ঞে হ্যাঁ। দু-তিনজন পাবলিশারকে লিখেছি, এখনও উত্তর পাইনি—পেলেই জানাব আপনাকে।

ললিতবাবু বলিলেন—আপনাকে কষ্ট করে আসতে হবে না। মণিয়া যখন বাড়ি চিনে গেছে, ওই পরশু লাগাৎ আর একবার যাবে এখন—

—মণিয়া বুঝি আপনার এখানে কাজ করে?

ললিতবাবু যেন ঢোঁক গিলিয়া বলিলেন—হ্যাঁ—ইয়ে—মণিয়া? ...হ্যাঁ—

আমি সেদিন বিদায় লইয়া আসিলাম। তৃতীয় দিন মণিয়া আমার বাসায় আবার গিয়া হাজির। এদিন আমার কৌতূহল হওয়াতে মণিয়াকে বলিলাম—ললিতবাবুর ওখানে কতদিন আছিস?

মণিয়া বেশি কথা বলে না, মুখ না তুলিয়া কি একটা বলিল ভাল বুঝিতে পারিলাম না। তাহার হাতে পাঁচটি টাকা দিয়া বলিলাম—ললিতবাবুকে গিয়ে বলো কলকাতা থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে—

মণিয়া টাকা কয়টি লইয়া চলিয়া গেল। ইহার পর দিনকতক ললিতবাবু আমাকে বড় উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। কোন্ পাবলিশার তাঁর বই লইতেছে—কি কথা হইতেছে তাঁহাদের সঙ্গে ইত্যাদি। বই পড়িয়া রহিয়াছে আমার বাসায়। কলিকাতার বইওয়ালারা এত বোকা নয় যে, ওই বইয়ের জন্য অগ্রিম টাকা দিতে যাইবে! মুখে বলিলাম—বই নেবে কি না তার ঠিক নেই, তবে যদি নেয় তার বায়নাস্বরূপ টাকাটা দিয়েছে।

ললিতবাবু বুঝিলেন না যে, আমার কথা সম্পূর্ণ অর্থহীন। বায়না করা ইহাকে বলে না, বা এ অবস্থায় কেহ বায়নার টাকাও দেয় না। অভাবের দিনে টাকা আসিয়াছে তাহাই যথেষ্ট, কোথা হইতে আসিল, কেন আসিল অত বুঝিয়া দেখিবার অবসর ওইচ্ছা তাঁহার ছিল না। সেই হইতে মাঝে মাঝে তাঁহাকে দু'এক টাকা পাঠাইয়া দিতাম মণিয়ার হাতে, কারণ মণিয়াকে বাঁধা নিয়মে প্রতি সপ্তাহে আমার বাসায় পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন।

কষ্টই হইত তাহার কথা ভাবিয়া। প্রৌঢ় হইলেও ললিতবাবু দেখিতে সুপুরুষ, ভাল হোক মন্দ হোক তিনিও একজন লেখক ছিলেন, আজ অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িয়াছে, তিন কুলেও এদিকে কেহ নাই। এই দূর বিদেশে এই বয়সে কে তাঁহাকে দেখে, কে মুখের দিকে চায়? টাকা কোন্ প্রকাশক পাঠাইতেছে, একথা তিনি আমায় মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেন। আমি কাল্পনিক পুস্তক প্রকাশকের নাম করিতাম, তাহাদের কাল্পনিক চিঠির কথা বলিতাম, কোনো রকমে সেকথা চাপা দিয়া অন্য কথা পাড়িতাম।

শীতের শেষে সেবার মুঙ্গের হইতে চলিয়া আসিলাম।

আসিবার পূর্বে ললিতবাবুর খাতা দুখানি তাঁহাকে ফেরত দিতে গেলাম। তিনি বলিলেন—কি হলো মশায়?

—বড্ড গোলমাল হয়ে গেল সব। ওদের সে দোকানখানা উঠে গেল। ভাইতে ভাইতে গোলযোগ, কেস রুজু হয়েছে, এ অবস্থায় আর ওরা—তাই পরশু আমায় খাতা ফেরত পাঠিয়েছে।

পুনরায় ঘটনাচক্রে মুঙ্গেরে গেলাম তিন বৎসর পরে।

গিয়াই সর্বপ্রথমে ললিতবাবুর কথা মনে হইল; কষ্টহারিণীর ঘাটে তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। দু-একজনকে জিজ্ঞাসাও করিলাম, ললিতবাবু মুঙ্গেরে আছেন না অন্যত্র চলিয়া গেছেন; কিন্তু বিশেষ কেহ কিছু বলিতে পারিল না।

একদিন শহরের বাহিরে টমটম ভাড়া করিয়া বেড়াইতে গিয়াছি, পথে শহর হইতে অন্তত ছ-সাত মাইল দূরে একটা বড় বাগানবাড়ি দেখিয়া টমটমওয়ালাকে বলিলাম—এ কার বাগানবাড়ি রে? টমটমওয়ালা ভাল বাংলা বলে। আমার কথার উত্তরে সে বলিল—ই বেণীগীর ফুলবাড়ি আছে। শুনিয়াই বাগানটা দেখিবার শখ হইল।

—দেখতে হয়?

—হাঁ বাবুজি, উঁহা এক বাঙালি বাবু আছে—দেখনে কাহে নেই দেবে?

আমার আগ্রহ আরও বাড়িল বাঙালি বাবুর নাম শুনিয়া। টমটম গেটের সামনে দাঁড় করাইয়া বাগানের ভিতর গেলাম। অদ্ভুত বাগান। দেখিয়াই বুঝিলাম—এককালে খুব বড় ও শৌখিন বাগানবাড়ি ছিল, বর্তমানে সে অবস্থা নাই, কিন্তু বনে জঙ্গলে সমাকীর্ণ এই পরিত্যক্ত বাগানবাড়ির বন্য সৌন্দর্য আমাকে বড় মুগ্ধ করিল।

গেট হইতে কাঁকর বিছানো পথটি বাঁকিয়া চলিয়াছে—গাছপালার আড়ালে যে ভাঙা পুরাতন বাড়ির চুন-বালি-খসা শ্রীহীন, জীর্ণ রূপ দেখা যাইতেছে সেদিকে। বাগানের সর্বত্র খুব বড় বড় বৃদ্ধ গাছ—প্রধানত বট, অশ্বত্থ, নিম, মেহগনি, কৃষ্ণচূড়া,ছাতিম ইত্যাদি। গাছগুলির তলায় ঘন ফার্ন ও কাঁটাজঙ্গল, এখানে ওখানে জংলী গোলাপের ঝোপ, কালো পাথরের হাতির মুখ, মকরমুখের পয়ঃনালী, হাতল-ভাঙা লোহার বেঞ্চি, চটা ওঠা ঠেস গাঁথা চাতাল, জঙ্গলের নীচে লতায় পাতায় কাঠবেড়ালীর লঘুপদে ত্রস্ত যাওয়া-আসা, বনটিয়ার ডাক, বড় বড় গাছের পাতার ফাঁক দিয়া সূর্যালোক আসিয়া পড়িয়াছে, একটা পাথরে গাঁথা শুকনো ফোয়ারার ধারে ঘন চামেলির ঝোপ, চামেলি ফুলের মিষ্টি সুবাস, প্রাচীন বটগাছে ডাহুক পাখির ডাক, আর পায়ের নীচের আধশুকনো লম্বা লম্বা উলুঘাসের মধ্যে বহুরূপীর গতিবিধির খড়মড় শব্দ... সবটা মিলাইয়া একটা নিবিড় শান্তি ও নীরবতা।

কোনো বড়লোকের বাগান ছিল এক সময়, বোধ হয় অবস্থা খারাপ হইবার জন্য আর বাগান দেখাশোনা করিবার শখ নাই! ফোয়ারার কাছে দাঁড়াইয়া এইসব দেখিতে দেখিতে ঐশ্বর্যের নশ্বরতা লইয়া বেশ একটা গম্ভীর ধরনের প্রবন্ধ (যাহাতে মানুষের ও সমাজের সত্যকার উপকার হয়, হালকা গল্প বা উপন্যাস লিখিয়া লাভ কি?) রচনা করিব ভাবিতেছি, এমন সময় হঠাৎ চমকিয়া উঠিলাম।

আমার সামনের কাঁকরের পথ দিয়া আসিতেছেন কষ্টহারিণী ঘাটের সেই লেখক ললিত ঘোষাল।

আমি বলিলাম—ললিতবাবু যে! এখানে কি রকম? চিনতে পারেন?

ললিতবাবু চিনিতে পারিলেন। আমায় দেখিয়া খুব খুশি হইলেন। আমায় জোর করিয়া বাড়ির দিকে লইয়া চলিলেন—আজ এখানে থাকিতে হইবে, কোনো অসুবিধা নাই। কতকালের পর দেখা, অনেক কথা আছে, ইত্যাদি।

বাড়িটা খুবই পুরানো, সামনে খুব বড় রোয়াক বা চাতাল, সেখানে আমরা পাথরের বেঞ্চিতে গিয়া বসিলাম। ললিতবাবুকে বলিলাম—তার পর? আপনাকে কত খুঁজেছি—মুঙ্গের শহরে আজ দিন পনেরো এসেছি। এখানে গড্‌ফরসেকন জায়গায় কি করে এসে পড়লেন? কিনেছেন নাকি? এখানে আর থাকে কে?

ললিতবাবু হাসিয়া বলিলেন—আরে, ব্যস্ত হবেন না। সবই দেখতে পাবেন। আপাতত একটু চা খান—দাঁড়ান বলে আসি—

ললিতবাবু কাহাকে চায়ের জন্য বলিয়া আসিলেন তখন বুঝি নাই, কিন্তু প্রায় আধ ঘণ্টা পরে যে ব্রীড়াবনতা সুন্দরী হিন্দুস্থানী মেয়েটি চা ও পাঁপরভাজা আনিয়া আমাদের সামনে রাখিল, তাহাকে দেখিয়া চিনিলাম। ললিতবাবু বলিলেন—চিনেছেন এঁকে?

—হ্যাঁ, ও তো সেই মণিয়া! ও তা হলে এখনও আপনার কাছেই কাজ করে? কথাটা শুনিয়া ললিতবাবু হাসিলেন, মণিয়ার মুখেও সলজ্জ হাসির রেখা ফুটিল। সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। ব্যাপার কি? আমার কথার মধ্যে হাসিবার কি আছে ভাবিয়া পাইলাম না।

ললিতবাবু বলিলেন—মণিয়া যাও, আর একটু চা দাও আমাদের—

মণিয়া চলিয়া গেলে ললিতবাবু আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—কে কার কাজ করে মশাই? মণিয়াকে আপনি ভাল করে কোনোদিন জানেন না। এই ফুলবাড়ি ওর নিজের। আমি ওর আশ্রয়ে আছি। এটা ওর বাপের বাড়ি।

মণিয়াকে ললিতবাবুর ঝি বলিয়াই জানিতাম, কখনও আমার মনে আসে নাই যে, সে ছদ্মবেশিনী রাজকুমারী, সুতরাং কথাটা শুনিয়া তো দস্তুরমত আশ্চর্য হইলাম। বলিলাম—মুঙ্গেরে যখন থাকতেন আপনি, তখন মণিয়া তো আপনার বাসায় কাজ করত—

ললিতবাবু হাসিয়া বলিলেন—কখনও আমার বাসায় কাজ করতে ওকে দেখেছিলেন? আন্দাজ করেছিলেন আপনাকে ডেকে আনত বলে। আসল কথা জানতেন না।

—আসল কথাটা কি তাড়াতাড়ি বলুন, রহস্যটা কোথায়?

—মণিয়ার বাবার সঙ্গে ওর মায়ের বিয়ে হয় নি। ওর বাবা মস্ত ধনী জমিদার ছিলেন, ওর মা মজঃফরপুর জেলার এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থের মেয়ে—এই বাগানবাড়িতে এনে ওর বাবা তাকে তাঁর কাছে রাখেন। মণিয়া ওদের একমাত্র সন্তান—এখন দুজনেই পরলোকগত, মণিয়া এই বাগানবাড়ির মালিক। বুঝলেন কিছু? খুব সোজা কথা!

—খুব সোজা কথা নয়। মণিয়ার সঙ্গে আপনার কি ভাবে আলাপ, আপনিই বা এখানে থাকেন কেন, মণিয়ার অভিভাবকই বা কে ছিল—এসব কথা খুব সোজা আর কই?

ললিতবাবু বলিলেন—সে আরও সোজা কথা। আমি মণিয়ার বাবার প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলাম, তাঁর মৃত্যুর পর আমিই এখন মণিয়ার অভিভাবক। আর একজন অছি আছেন, মুঙ্গেরের উকিল বাবু কমলেশ্বরী সহায়। মধ্যে আমাকে ওরা সবাই ষড়যন্ত্র করে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তাই মুঙ্গেরে গিয়ে বছরখানেক ছিলুম। মণিয়া প্রায়ই আমার সঙ্গে দেখা করতে যেত। আপনার কাছে ওকে পাঠাতুম বইয়ের দরুন টাকা আনতে। ও নিজেও অনেক সাহায্য করেছে—

বলিলাম—ওর বিয়ে হয়নি?

ললিতবাবু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—ওর এই ইতিহাস শুনে কে ওকে বিয়ে করবে বলুন! বিশেষত, এ দেশ তো জানেন?

ইতিমধ্যে সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল, বেলা আর বেশি নাই, চামেলি বনের ধারে পাথরের বেঞ্চিতে বসিয়া আমাদের গল্প জমিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় মণিয়া আবার চাআনিল।

ললিতবাবু বলিলেন—মণিয়া, এ বাবুকে চিনতে পেরেছ?

মণিয়া হাসিয়া মাথা নাড়িল।

—কোথায় দেখেছিলে বল তো?

—মুঙ্গেরে। ওঁর বাসায়।

পরে আমার দিকে চাহিয়া হাসিমুখে ওর অভ্যস্ত দেহাতি হিন্দিতে বলিল— ভাল আছেন বাবুজী?

—হ্যাঁ। তুমি ভাল আছ মণিয়া?

এই সময় ললিতবাবু বলিলেন—রাত্রে কিন্তু থাকতে হবে আপনাকে। আমি দুটো কথা বলবার লোক পাইনে, এসেছেন যদি থাকুন। মণিয়া তুমিও থাকতে বল।

—আমিও তো বলছি, থাকুন বাবুজী। ভারি খুশি হব থাকলে।

অগত্যা রাজি হইতে হইল।

দেখিলাম মণিয়া সত্যই খুশি হইল। বলিল—রাত্রে আপনি কি খান বাবুজী? উনি পুরী খান—আপনিও তাই খাবেন তো?

ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, মণিয়া সত্যই সুন্দরী মেয়ে। হিন্দুস্থানী মেয়ের দেহের গড়ন ও বাঙালি মেয়ের লাবণ্য, এ দুটির অপূর্ব সমাবেশ হইয়াছে মণিয়াতে। দেহবর্ণ চম্পক গৌর, কাশ্মিরী মেয়ের মত ঈষৎ গোলাপী। মাথায় ঘন কালো একঢাল চুল। বড় বড় চোখ। আমার আশ্বাস পাইয়া মণিয়া উৎসাহের সহিত বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল—সম্ভবত রান্নাবান্না করিতে গেল।

ললিতবাবু বলিলেন—বড্ড সেবাযত্ন করে আমাকে—মানে খুব। তা মানবে না? আমাদের সঙ্গে ওদের কথা? কত কান্নাকাটি করে আমায় আনল।

রাত্রে চমৎকার চাঁদ উঠিল। জ্যোৎস্নার আলো বেণীগীর ফুলবাড়ির প্রাচীন বট, মেহগণি ও পাইন গাছের ডালে পড়িয়া সমস্ত উদ্যানটিকে যেন এক রহস্যময় পুরানো দিনের জগতে পরিণত করিল। আমার মনে পড়িল দুটি প্রেমিক-প্রেমিকার কথা— মণিয়ার বাবা ও মা—তাঁরা সমাজ সংসারকে তুচ্ছ করিয়া এই নিভৃত নিরালা বাগানে পরস্পরের প্রণয়কে মাত্র সম্বল করিয়া জীবনের দিনগুলি কাটাইয়া গিয়াছেন।

মণিয়া আমাদের ডাকিয়া লইয়া গেল খাইবার জন্য। তখন রাত দশটার কম নয়। এই এত বড় বাড়ির নিভৃত রান্নাঘরটিতে বসিয়া মেয়েটি এতগুলি রান্না রাঁধিয়াছে, এক চুপড়ি আটার পুরী ভাজিয়াছে—আগুনের তাতে সুন্দর মুখখানি রাঙা, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম—দীর্ঘ কালো কেশপাশ অবিন্যস্ত—দেখিয়া তাহার উপর কেমন মমতা হইল।

মণিয়া কাছে বসিয়া আমাদের যত্ন করিয়া খাওয়াইল, নিজের হাতে ললিতবাবুকে তামাক সাজিয়া দিয়া গেল, মশলা সুপারী দিয়া গেল—হিন্দুস্থানীর দেশে পান খাওয়ার তেমন রেওয়াজ নাই।

ললিতবাবুর উপর হিংসা হইল—লোকটা তোফা তোয়াজে আছে। মণিয়ার মত মেয়ের সেবা যে দিনরাত পায়, তাহার উপর হিংসা হয় বইকি! লোকটার বরাত ভাল।

এইভাবে ললিতবাবুর সঙ্গে যে আলাপ-পরিচয়ের সূত্র পুনরায় স্থাপিত হইল, আমার এক বৎসরব্যাপী মুঙ্গের প্রবাসের মধ্যে সেই সূত্র ধরিয়া অনেকদিন বেণীগীর ফুলবাড়িতে গিয়াছি।

বার দুই যাইবার পরে আমার কৌতূহল বড় বাড়িল। হয়তো আমার সেকৌতূহল অযথা ধরনের, তবুও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কৌতূহল শুধু এই বিষয়ে যে, মণিয়া ও ললিতবাবুর মধ্যে সম্পর্কটি কি! ললিতবাবুর বয়স বাহান্ন হইতে পারে, সাতান্ন হইতে পারে, ষাট বলিলেও দোষ ধরিতে পারা যায় না। মণিয়ার বয়স খুব বেশি হইলেও চব্বিশের বেশি কখনও নয়।

পিতা-পুত্রীর সম্পর্ক! ছাত্রী-শিক্ষকের সম্পর্ক! অভাবপক্ষে ভাই বোনের সম্পর্ক! বয়স হিসাবে তাই হওয়া উচিত এবং হইলে দেখাইত খুব ভাল, মানিয়া লইতাম। কিন্তু জগতে যাহা ভাল দেখায়, যাহা হওয়া উচিত, তাহা সব সময় ঘটে না ইহাই দুঃখ।

একদিনের কথা বলি, কি করিয়া প্রথম আমার সন্দেহ হইল।

সেদিন ভয়ানক গরম, দারুণ রোদের তাত, বেলা তিনটার সময় আমি গিয়াছি ওখানে, গিয়া দেখি মণিয়া ছাড়া আর কেহ নাই বাড়িতে।

সে আমায় দেখিয়া প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল—বাবুজী, উনি কোথায় বেরিয়ে গিয়েছেন দুপুরের পরে, এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরবার কথা—এখনও ফিরলেন না, কি হবে?

জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম, ললিতবাবু বালিশের জন্য শিমুল তুলা কিনিতে গিয়াছেন নিকটবর্তী কি একটা বস্তিতে। আমি যত মণিয়াকে বোঝাই, তাহার সে কি ব্যাকুলতা, কি উদ্বেগ, বার বার ঘরবাহির করার সে কি চঞ্চল ভঙ্গি! আমি সেদিন মণিয়াকে নতুন দৃষ্টি দিয়া দেখিলাম যেন। সেই একদিন দেখিয়াই আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলাম, মণিয়া ললিতবাবুকে ভালবাসে। পিতাপুত্রী নয়, ভাইবোন নয়— নায়িকার মত ভাল না বাসিলে ঠিক সে জিনিসটি হয় না—চোখে না দেখিলে কি করিয়া তাহাবুঝাইব!

তাহার পর ললিতবাবু একদিন আমাকে সামান্য একটু বলিলেন। কথায় কথায় মণিয়ার কথা উঠিলে আমায় বলিলেন—ও আমার মুখের দিকে চেয়ে ওর যৌবনের দিনগুলো কাটাল—কতবার ভাবি, আমার অবর্তমানে ওর কি যে হবে! সমাজে ওর স্থান কোনোদিনই নেই। আমায় ছাড়া ও কাউকে জানেও না। ভেবে কষ্ট হয় এক এক সময়।

একটি কুড়ি-একুশ বছরের তরুণী যে একজন পঞ্চান্ন বছরের (কম পক্ষে) বৃদ্ধকে নিবিড়ভাবে ভালবাসিতে পারে, নিজের চক্ষে দেখার পূর্বে সে কথা কেহ যদি বলিত, তাহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম।

জীবনের কি রহস্যই বা আমরা জানি! মণিয়ার ভালবাসা দেখিয়া জীবনের একটি অজ্ঞাত তথ্য জানিয়া বিস্মিত হইলাম।

আরও একটি ব্যাপার দেখিলাম।

ললিতবাবু সম্পূর্ণ বেকার, একটি কানাকড়ি দিয়াও তিনি মণিয়াকে সাহায্য করিতে অক্ষম, অথচ তাঁহার যাহা কিছু খরচ সব জোগাইতে হয় মণিয়াকেই এবং সে অম্লান বদনে তাহা এযাবৎ সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। ললিতবাবু তাঁহার স্বগ্রামস্থ এক বেকার ভ্রাতুস্পুত্রকে মাসিক অর্থসাহায্য করেন (চার পাঁচ বার ললিতবাবু আমাকেই টাকাটাদিয়াছিলেন মনিঅর্ডার করিবার জন্য, কারণ তাঁহাদের এখানে নিকটে ডাকঘর নাই), তাহাও মণিয়ার পয়সায়। ললিতবাবু যখন একা মুঙ্গেরের বাসায় থাকিতেন, তখনকার অপেক্ষা এখন তাঁহার চাল অনেক বাড়িয়াছে। পরের পয়সায় আমাদেরও বাড়িত। কথাবার্তার মধ্যে একদিন ললিতবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মণিয়ার বাবার প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন কতদিন? কি ভাবে আলাপ হয়?

—শুনবেন? কলকাতায় যখন বইটই আর কেউ নিতে চায় না, পাবলিশার খুঁজে পাইনে, তখন তো এলাম মুঙ্গেরে, আজ থেকে বছর বারো আগে। বাবু কমলেশ্বরী সহায় এখানকার বড় উকিল, তিনি বল্লেন, একজন বড়লোক মক্কেল বাঙালি সেক্রেটারি খুঁজছে, ইংরিজি চিঠিপত্র লেখার জন্য—তাই এখানে এসে মণিয়ার বাবার সঙ্গে দেখা করি; চাকুরিও হয়ে গেল—সাত বছর ছিলাম। মণিয়ার বাবা মারা যাওয়ার পরে আমি এখান থেকে গিয়ে মুঙ্গেরে বাসা করে থাকতাম, সে অবস্থায় আপনি আমায় দেখেছিলেন সেবার। মণিয়া জোর করে আবার নিয়ে এল এখানে। কি করি বলুন!

সত্যই তো। বেচারি ললিতবাবু! কি করিবার ছিল তাঁর? মণিয়াকেও দেখিয়াছি, ললিতবাবুকে সে ছায়ার মত অনুসরণ করে। তাঁহার এতটুকু কষ্ট বা অসুবিধা—বাস্তব বা কাল্পনিক, দূর করিতে কি ব্যাকুলতা! নিজের চোখে

যাহা দেখিতে পাই তাহাকে অবিশ্বাস করিতে পারি কই?মাস কয়েক যাতায়াতের ফলে ক্রমে আমার মনে হইল যে, মণিয়া যতটা করে, ললিতবাবুর দিক হইতে তাহার অর্ধেকও নাই, বরং আরও কম। ললিতবাবু এখানে আছেন যে, তাহার কারণ মণিয়ার উপর তাঁহার দরদ নয়, তিনি বর্তমানে বেকার, মণিয়া তাঁহার সব খরচ চালাইয়া থাকে—এইজন্য।

ললিতবাবু মণিয়াকে তাহার ঝি বা পাচিকার মত ভাবেন যেন, হুকুমের উপর তাকে সর্বদা রাখিয়াছেন। অনেক সময় ভাবটা এই রকম দেখান যে, তিনি অতি বড়লোক বাঙালি, এখানে যে অবস্থান করিতেছেন সে নিতান্তই মণিয়ার উপর কৃপা করিয়া!

বেণীগীর ফুলবাড়ির প্রাচীন বনস্পতিদের ছায়ায় চামেলি ঝোপের ধারের হাতল-ভাঙা লোহার বেঞ্চিতে বা পুকুরের ভাঙা ঘাটে বসিয়া কতদিন তরুণী মণিয়ারজীবনের এ অদ্ভুত ট্রাজেডির কথা চিন্তা করিয়াছি।

জগতে কেন এমন ঘটে, অমন সুন্দরী মেয়ে—কত তরুণ প্রেমিক যাহার এক কণা অনুগ্রহ পাইবার জন্য অসাধ্য সাধন করিতে রাজি হইতে পারিত—তাহার অদৃষ্টে এ কি দুর্ভোগ!

একদিন এ অবস্থায় একা বসিয়া আছি, মণিয়াকে দূরে দেখিতে পাইয়া ডাকিলাম। এ সময়টা সে খানিকক্ষণ আপনমনে বাগানে বেড়ায় জানি।

মণিয়া কাছে আসিয়া বলিল—এখানে বসে কেন বাবুজী?

—বেশ বসে আছি। ললিতবাবু উঠেছেন?

—এখনও ওঠেন নি। উনি ঠিক চার বাজলে ওঠেন—তারপর চা করব।

ললিতবাবুর বৈকালিক নিদ্রা ঘড়ির কাঁটার মত বাঁধা পথ ধরিয়া চলে, নিয়মেরএতটুকু ব্যতিক্রম বড় একটা ঘটিতে দেখিলাম না।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে...

মণিয়ার পরনে একখানা হাল্কা চাপা রঙের শাড়ি, গায়ে হিন্দুস্থানী মেয়েদের মত কোর্তা, সুগঠিত গৌরবর্ণ বাহু দুটিতে বাজু, কানে বড় বড় কানবালা, কপালে কালো টিপ। রূপকথার রাজকুমারীর মত সম্পূর্ণ সেকেলে ধরনের বেশভূষা ওর, হালফ্যাশানের বড় একটা ধার ধারে না, দেহাতি মেয়ে, সম্ভবত জানেও না।

বলিলাম, বসো মণিয়া—

—না বাবুজী, দাঁড়িয়ে আছি বেশ, সারাদিন তো বসে থাকি—

—তুমি আপনমনে বেড়াও এ সময়টা, না?

—হ্যাঁ বাবুজী, উনি ঘুমোন, আমার কাজকর্ম থাকে না—একটু বেড়িয়ে বেড়াই—

—ঘুমোও না বুঝি?

—না, দুপুরে আমার ঘুম ভাল লাগে না। অভ্যেস নেই বাবুজী।

—আচ্ছা, এ বাগানে কতদিন আছ?

—ছেলেবেলা থেকেই। এই তো আমাদের বাড়িঘর। বাবা মা ছিলেন যখন, তখন খুব ভাল ছিল—বাবার বাগানের শখ ছিল খুব। নিজের হাতে গাছ পুঁতেছিলেন কত। একটা বটগাছ আছে বাবার হাতে পোঁতা, তার পাতাগুলো জুড়ে ঠোঙার মত হয়ে যায়—নাকি কৃষ্ণজী দুধ খেতেন বলে বৃন্দাবনে যমুনার ধারে অমনি হত, বংশীবট বলে এদেশে। আসুন, দেখবেন!

আমাকে সে পুকুরের ওপারে বাগানের দক্ষিণ কোণে লইয়া গেল। বনের মধ্যে একটা ছোট বটগাছ, তাহার কচি পাতা পরস্পর জোড়া লাগিয়া ঠিক যেন ঠোঙার মত। মণিয়া আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, দেখলেন? কি তাজ্জব বাবুজী, না?

বিস্মিত হইবার মত মুখ করিয়া বলিলাম, তাজ্জবই বটে, সত্যি—

মণিয়া হাত নাড়িয়া উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিল—দেখুন, কতকাল আগে কৃষ্ণজী দুধ খেতেন বলে এখনও পাতাগুলো ওর জোড়া লেগে যায়! এতেও লোকেরঅবিশ্বাস ঘোচে না—বলুন বাবুজী!

বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম—ঠিক বলেছ মণিয়া—খুব ঠিক—

উহার সরল বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করিবার আমি কে?

জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমার বাবা কতদিন মারা গিয়েছেন?

—ছ বছর বাবুজী।

—উনি মারা যাওয়ার পর কোথায় ছিলে?

—কোথাও না বাবুজী, এখানেই। আমার দাই-মা আর চাচেরা ভাই সঙ্গে থাকত।

—তা ওরা এখন কোথায়?

—উনি আসতে চলে গিয়েছে। কি করি বাবু, মুঙ্গেরে বড় কষ্ট পেতেন উনি, বাবা এমন কিছু রেখে যান নি যে সেখানকার সব খরচ দিই। তবে এখানে থাকলে চলেযায় এক রকমে। ওঁর কষ্ট চোখে দেখে থাকতে পারলাম না, তাই নিয়ে এলাম।

—তোমার ভাই তাতে চটল বুঝি?

—উঃ, ভারি রাগ তাতে, বলে বাংগালি বাবুকে কেন নিয়ে এলি তুই? আমিও বলেছি—ওর আসা পছন্দ না কর চলে যাও; আমার বাড়ি, আমি যা ভাল বুঝব করব। তাই চলে গেল। এখন উনি ছাড়া আর আমার কে আছে বাবুজী!।

মণিয়ার চোখ দুটি ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিল। মেয়েটি সত্যবাদিনী, তাহার স্পষ্ট সত্য কথা বলিবার সাহস দেখিয়া প্রীত হইলাম। অন্য কথা পাড়িবার জন্য বলিলাম—গান গাইতে পার মণিয়া?

মণিয়া সলজ্জকণ্ঠে বলিল—বেশি কিছু না বাবুজী, বহুৎ একটু—

—গাইবে? গাও না?

মণিয়া কি বুঝিল জানি না, বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া প্রতিবাদের সুরে বলিল—বাবুজী—

আমি মণিয়ার সহিত প্রেম করিতে চাহি নাই। মণিয়া আমাকে ভুল বুঝিয়া বসিল। সেভাবে কথাটা বলি নাই আমি। বলিলাম—এখন না হয়, সন্ধ্যের সময় কোরো। ললিতবাবু যদি বলেন—তাহলে গাইবে?

অতিথির প্রতি উহার কর্তব্যবোধ ও ভদ্রতা বড়ঘরের ঘরানার উপযুক্ত বটে। কি সুন্দরী দেখাইতেছে মণিয়াকে! উহাকে দেখিলেই আমার মনে হয় ও সেকালের মেয়ে, সেকালের বেশভূষায়, প্রাচীন উদ্যানের বনস্পতিদের পটভূমিতেই ওকে মানায়, অন্যত্র ও নিতান্ত খাপছাড়া।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে, প্রাচীন বটের ডালে ডাহুক ডাকিতেছে, ললিতবাবুর ঘুম ভাঙিবার সময় হইল। বলিলাম—চলো মণিয়া, চারটে বাজে—

সন্ধ্যার পর ললিতবাবুকে বলিয়া মণিয়াকে গান গাওয়াইলাম। ওর এমনি খুব সুরেলা গলা, তবে বিহারী দেশওয়ালী গ্রাম্যসুরের গানই বেশি জানে। বেণীগীর ফুলবাড়িতে বড় বড় গাছপালা, মেহগণি, কৃষ্ণচূড়া,

চামেলির বন আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে মুছিয়া গেল গান শুনিতে শুনিতে—আমি যেন অতীত যুগের ভারতে ফিরিয়া গিয়াছি। বাণভট্ট কি শূদ্রক বা ওই ধরনের কোনো কবির নায়িকা জীবন্ত হইয়া যেন আমার সামনে বসিয়া সুন্দর হাতটি নাড়িয়া বীণা বাজাইয়া অর্ধমাগধী ভাষায় সংগীত গাহিতেছে...

সেদিন জ্যোৎস্নারাত্রের আলোছায়ার মধ্যে মণিয়াকে দেখিয়া আমার মনে হইল, কবি বাণভট্ট সে যুগের ঠিক এমনি একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখিয়া তাঁহার কাব্যের মহাশ্বেতার কল্পনা করিয়া থাকিবেন—সমগ্র বৃদ্ধ পৃথিবীকে নবযৌবনের সাজে সাজাইবার মায়ামন্ত্র যে ইহাদের সুন্দর মুখের স্মিতহাস্য, ইহাদেরই পদ্মপলাশলোচনের অশ্রুজল। হয়তো তখন আমার বয়স কম ছিল বলিয়াই মণিয়াকে আমার অত ভাল লাগিয়াছিল। এখনও বিহার বা পশ্চিমের কথা মনে হইলেই আমার মনের চোখেভাসিয়া ওঠে বেণীগীর ফুলবাড়ি, তার প্রাচীন গাছপালা, চামেলি বন ও রূপসী মণিয়া।

মাস খানেক পরে।

একদিন ললিতবাবু মুঙ্গেরে আমার বাসায় আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া খুশি হইয়া বলিলাম, আসুন আসুন, ললিতবাবু, কখন এলেন?

ললিতবাবু কপালের ঘাম মুছিয়া বলিলেন—এই এলাম মশাই। দেশে যাচ্ছি।

একটু বিস্মিত হইয়া বলিলাম, দেশে?

—হ্যাঁ দেশে। ওখান থেকে চলে এলাম—

—চলে এলেন? তার মানে?মণিয়া কেমন আছে?

ললিতবাবু ঝাঁজের সহিত বলিলেন—ভালই আছে। আমার পোষালো না, চলে যাচ্ছি।

—ব্যাপার কি? হলো কি?

—হবে আর কি! আমি কারও হাত-তোলা খেয়ে থাকতে পারব না। হয়েছে কি, আমার বাড়িতে একটা সাড়ে এগারো টাকার রেভিনিউ মনিঅর্ডার পাঠাতে হবে, আজ কদিন ধরে চাচ্ছি টাকাটা। কবার চাইব? আমার মান বলে একটা জিনিস আছে তো? আজ দেব, কাল দেব—- আজ ওবেলা নিয়ে এসেছে পাঁচটি টাকা! ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। আরে, আমার বইয়ের এককালে তিন-তিনটে এডিশন হয়েছে, আমায় টাকা চেনাতে হবে না। ওর মা মাগী ছিল ভ্রষ্টা, ওদের কি ভদ্রস্থতা আছে মশাই? ভদ্রলোকের খাতির কি বোঝে ছাতুখোর মেড়ুয়াবাদীর দল?

ললিতবাবুর মুখের এ কথার কিছুদুর পর্যন্ত আমি প্রণয়ীর অভিমান বলিয়া ধরিয়া লইতে পারিতাম হয়তো, কিন্তু তাঁহার উক্তির সবটা এভাবে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। তাঁহার চরিত্র ও মেজাজের উপর আমার অশ্রদ্ধা হইয়া গেল। টাকার জন্য আমাকে পূর্বে তিনি কি রকম উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন (কারণ তাঁহার পুস্তক প্রকাশের আসল উদ্দেশ্য সাহিত্যপ্রীতি নয়—টাকা, তাহা অনেক দিন বুঝিয়াছি), সে কথা মনে পড়িল।

আমি বলিলাম—হয়তো মণিয়ার কাছে নেই, এ হতে পারে।

—নেই তো কি মশাই, সাতটা টাকা আর নেই? এর আগেও বাড়িতে টাকা পাঠাবার বেলা এরকম করেছে। তাছাড়া ঠিক সে কথাও নয়, আমার আর ভাল লাগছে। না এ ছাতুখোরের দেশ। দেশে গিয়ে মানকচু আর নলেনগুড়ের পায়েস খেয়ে বাঁচি দিনকতক। রাঁধতে পারে কেউ এদেশে? যা রাঁধবে এক তরকারি, বেগুন বেগুনই একতরকারি, পটল পটলই এক তরকারি—এ দেশে মানুষ আছে? রামোঃ—

বলিলাম—দেশে কে আছে আপনার?

—ভাইপো আছে, ভাইপোর স্ত্রী আছে, তাদের ছেলে-মেয়েরা আছে, নেই কে? তাদের ফেলে বিদেশে থাকা কি পোষায় এই বয়সে, বলুন তো? দেশে থাকলে অভাব কি আমার? এ ছাতুর দেশে আর না, ঢের হয়েছে, হাঁপিয়ে উঠেছে প্রাণ— ঘরের ছেলে। ঘরে ফিরে যাই।

মনে ভাবিলাম জিজ্ঞাসা করি, দেশে থাকিলে যদি চলিবার ভাবনা নাই, তবে ভ্রাতুস্পুত্রটিকে প্রতি মাসে টাকা পাঠানোর কি দরকার হইত ছাতুর দেশ হইতে? এবং তাও একটি ছাতুর দেশের সরলা মেয়ের নিকট হইতে ভুলাইয়া লওয়া টাকা?

নাঃ, লোকটা অকৃতজ্ঞের একশেষ! চলিয়া গেল দুপুরের ট্রেনে। আমি তুলিয়া দিতে পর্যন্ত গেলাম না। ঘৃণা হইল লোকটার প্রতি।

ললিতবাবু চলিয়া যাইবার দুদিন পরে আমার বাসায় জানলার কাছে বসিয়া আছি, এমন সময় দেখি মণিয়া বাসার সামনে টমটম হইতে নামিতেছে। আমি গিয়া তাহাকে ঘরের মধ্যে আনিয়া বসাইলাম। মণিয়া উদ্বিগ্ন স্বরে বলিল—বাবুজী, উনি কোথায় জানেন? আপনার এখানে এসেছিলেন? ওখান থেকে বেরিয়েছেন আজ দুদিন হলো, সঙ্গে টাকাকড়ি আছে, উনি তো আপন-ভোলা মানুষ—আমার বড্ড ভয় হয়েছে—মুঙ্গের বড় খারাপ জায়গা বাবুজী—

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—টাকাকড়ি কিসের?

—আমার হার ছড়াটা ভেঙে গড়াতে দেবেন বলে সঙ্গে আনলেন, আর পঞ্চাশটা টাকা—ওঁর নিজের কি দরকার আছে বল্লেন; আর বাগানের বড় চাতালটা—যেখানে বসে আপনারা চা খান, ওটা মেরামত করবার জন্যে চুন আর সিমেন্ট কেনবার দরকার—তাই, কালই ফিরবার কথা ছিল, কিন্তু আজ সকালেও যখন এলেন না তখন আর স্থির থাকতে পারলাম না—আপনার এখানে আসেন নি বাবুজী?

ব্যাপার শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম।

কেন জানি না, মণিয়াকে ব্যাপারটা খুলিয়া বলিতে পারি নাই। অর্থনষ্টের দুঃখ হইতেও বড় দুঃখ আছে—এই সরলা দেহাতি তরুণীর মনে সে দুঃখ বড় বিষম বাজিত। হয়তো মণিয়ার প্রতি কোনো ধরনের দুর্বলতা ছিল আমার, তাই সে দুঃখের হাত হইতে তাহাকে বাঁচাইলাম।

—বলিলাম, ললিতবাবু ভাইপোর অসুখের খবর পেয়ে হঠাৎ দেশে চলে গিয়েছেন, আমার ঠিকানায় তার এসেছিল। টাকাটা সঙ্গে নিয়ে গেছেন, খরচপত্রের দরকার আছে বল্লেন। হারগাছটা তাড়াতাড়িতে দিতে পারেন নি, দেশের স্যাকরাকে দেবেন ভেঙে গড়াতে।

ইহার পর আমি বেশিদিন মুঙ্গেরে ছিলাম না; যে কদিন ছিলাম মণিয়া ছয় সাত দিন অন্তর আসিয়া ললিতবাবুর কোনো চিঠি আসিল কিনা খবর লইত। বলা বাহুল্য,ললিতবাবু কোনো চিঠি দেন নাই।

সেই মাঘ মাসে আমি মুঙ্গের হইতে চলিয়া আসিলাম এবং তাহার পর প্রায় পাঁচ বছর ওদিকে যাই নাই। বিগত ১৯৩৪ সালের বিহার ভূমিকম্পের পর পিসিমাদের দেখিতে আমি আবার মুঙ্গেরে যাই।

মুঙ্গেরে পদার্পণ করিয়াই শহরের চেহারা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। সে মুঙ্গের নাই—চারিদিকে ধ্বংসের প্রলয় তাণ্ডবের পদচিহ্ন। অবশ্য ভূমিকম্পের পর তখন তিনচার মাস উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

সপ্তাহখানেক পরে একদিন কি মনে করিয়া একখানি টমটম ভাড়া করিয়া বেণীগীর ফুলবাড়ির দিকে রওনা হইলাম।

বেণীগীর ফুলবাড়িতে মণিয়াদের সে জরাজীর্ণ বাড়িটা ভূমিকম্পে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, মণিয়াও বাঁচিয়া নাই, বাড়ি চাপা পড়িয়া হতভাগিনীর মৃত্যু হইয়াছে, বেণীগীর ফুলবাড়িতে প্রাচীন বট, মেহগণি, কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় মহাশ্বেতার বীণার ক্লান্ত সুর কাঁদিয়া চিরদিনের মত নীরব হইয়া গিয়াছে—ইহাই সেখানে নিশ্চয় দেখিব ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছিলাম।

কিন্তু তাহার বদলে যাহা দেখিলাম তাহার জন্য সত্যই প্রস্তুত ছিলাম না!

ফুলবাড়ির সামনে টমটম হইতে নামিলাম। ফটক দিয়া ঢুকিতেই গাছপালার ফাঁক দিয়া চোখে পড়িল, বাড়িটা যেন মাটির উপরেই দাঁড়াইয়া আছে। বাগানের ও বাড়ির অবস্থা দেখিয়া জনশূন্য বলিয়াও বোধ হইল

না। আরও কিছু অগ্রসর হইয়া শুকনো ফোয়ারাটার ধারে চামেলি বনের কাছে যাইতেই কাছে একটি মেয়েকে গাছের ডালে বাঁধা তারের আলনায় কাপড় মেলিয়া দিতে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। সেই সময় পায়ের শব্দে মেয়েটিও চমকিয়া আমার দিকে পিছন ফিরিয়া চাহিল। দেখিলাম সে মণিয়া।

মণিয়ার চেহারার কিছু পরিবর্তন হইয়াছে, একটু মোটা হইয়া গিয়াছে, মুখশ্রী বদলাইয়াছে, তবুও সে এখনও সুন্দরী।

বলিলাম—চিনতে পারো মণিয়া?

মণিয়ার ডাগর চোখ দুটিতে বিস্ময়ের দৃষ্টি তখনও কাটে নাই। আমার দিকে অল্পক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর উজ্জ্বল মুখে বলিল—বাবুজী? আসুন আসুন, এতদিন কোথায় ছিলেন? সেই চলে গেলেন—আর খোঁজ নেই, খবর নেই, কত ভেবেছি আপনার জন্যে।

—এখানে ছিলামই না—দিন কয়েক হলো আবার এসেছি। যে কাণ্ড হয়েছে দেখলুম তোমাদের দেশে! তারপর তুমি ভাল আছ?

মণিয়া সুন্দর ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আপনার আশীর্বাদে বাবুজী প্রাণে বেঁচে গিয়েচি সব! এ বাড়িটার বিশেষ কিছু হয় নি—আসুন না, চলুন বাড়িতে—

বলিলাম—বাড়িতে তুমি, এখন—মানে আর কে আছে?

মণিয়া বলিল—আমার দাই-মা, আর চাচেরা ভাই আছে—পরে সলজ্জ হাসিয়া বলিল—আর উনি আছেন।

পরম বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম—কে? ললিতবাবু?

মণিয়া পুনরায় সলজ্জ হাসিয়া চোখ নীচু করিয়া বলিল—আবার কে বাবুজী! সেই তো চলে গেলেন, দু-বছর ছিলেন দেশে। আমার দাই-মা আর চাচেরা ভাই আবার এল। তিন বছরের মাথায় উনি ফিরলেন। মাগো, এমনি রোগা হয়ে গিয়েছেন! বাঙলা মুলুকেরজল-হাওয়া একদম নরম, ওঁর এতকাল পশ্চিমে বাস, সহ্য হবে কেন? হাতে পয়সা যা নিয়ে গিয়েছিলেন, কবে উড়িয়ে বসে আছেন, আমার হাড় ছড়াটা পর্যন্ত—সে যাক্‌গে বাবুজী—ওঁর এই দাড়ি, চুল, ময়লা কাপড়, দশা দেখে তো কেঁদে বাঁচিনে। সেই থেকে আছেন। এখন বেশ শরীর সেরেছে। আর দেশে যাওয়ার নামটি মুখে আনতে দিইনে—

অবস্থা শুনিয়া মনে হইল, ললিতবাবুও বর্তমানে সেকথা মুখে আনিবেন এমন কাঁচা লোক তিনি কখনই নহেন! বলিলাম—কোথায় উনি?

মণিয়া হাসিমুখে বলিল—চলুন, আসুন বাড়িতে বাবুজী, ভারি ভাগ্যে আপনি এলেন। উনি খুব খুশি হবেন আপনাকে দেখে—এখনও ঘুম থেকে ওঠেন নি—চার বাজলেই উঠবেন—তারপর চা করব—আসুন।

প্রাচীন বটের ডালে পুরনো দিনের মত ডাহুক ডাকিতেছিল। বেণীগীর ফুলবাড়ি ঘুমন্ত স্বপ্নপুরী যেন, মণিয়া রাজকুমারী, ঘুম ভাঙিয়া সদ্য উঠিয়াছে। সময় এখানে অচল।

ললিতবাবু লোকটার উপর পুনরায় ভয়ানক হিংসা হইল।